শাশ্বত

নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণ ও বৈষ্ণবতীর্থ কাটোয়া

সোমেন পাল

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা শহর কাটোয়া। অজয়, ভাগীরথী ও শিবাই নদীর সংগমে অবস্থিত এই শহরটি একটি ঐতিহাসিক স্থান। এর পূর্ব নাম কণ্টকনগর। "Katwa (Sanskrit 'Katadvipa') has been proposed as the 'Katadupa' mentioned by Pliny the Elder (circa 24-74 CE), marking it as the city by which flows the River Amystis, taken to imply the Ajay River."[১]

চৈতন্যোত্তর কাল থেকে কাটোয়া 'শ্রীধাম' হিসেবে খ্যাতিলাভ করলেও বহু পূর্ব থেকেই এই অঞ্চল বৈষ্ণবসাধনার পীঠস্থান ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে 'পঞ্চধাম' বা প্রসিদ্ধ পাঁচটি বৈষ্ণব তীর্থের মধ্যে রাঢ়বঙ্গের কাটোয়া অন্যতম। অভিরাম দাস 'পাট-পর্যটন' গ্রন্থে লিখেছেন,

''নবদ্বীপ ধামে প্রভুর জন্ম হয়।
কাটোয়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয়॥
একচক্রা জন্মভূমি খড়দহে বাস।
শ্রীনিত্যানন্দের দুই ধাম জানিবা নির্যাস॥
শ্রীঅদ্বৈতধাম শান্তিপুরে হয়।
এই পঞ্চধাম সবে জানিহ নিশ্চয়॥''

চৈতন্য মহাপ্রভুর কাটোয়ায় আসার বহু আগে থেকেই কাটোয়ায় তাঁর সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীর শ্রীপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মন্তেশ্বর থানার দেনুড় গ্রামে বাঙালি ব্রাহ্মণ বংশে কেশব ভারতীর আবির্ভাব। মুকুন্দ মুরারি ভট্টাচার্যের দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ রামভদ্র অল্প বয়সে সংসারত্যাগী হয়ে মহীশূরে আচার্য শংকর প্রবর্তিত শৃঙ্গেরী মঠের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 'ভারতী' সম্প্রদায়ে দীক্ষাগ্রহণ করে কেশব ভারতী নামে পরিচিত হন। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-র মতে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন 'পুরী' সম্প্রদায়ের মাধবেন্দ্র পুরীর কাছেও, যিনি গৌড়ে প্রথম আবেগধর্মী প্রেমভক্তি প্রচার করেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় বৃন্দাবন, গৌড়বঙ্গ ও নীলাচলের মধ্যে যে-ত্রিভুজ সংযোগ ঘটেছিল তার মূলে ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী। ভক্তি আন্দোলনের ধারা প্রবর্তনের জন্য তিনি যে-ভৌগোলিক পথ নির্বাচন করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যও পরবর্তী কালে সেই পথ ধরেই ভক্তি আন্দোলনের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন।[২]

দীক্ষাগ্রহণান্তে বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণের পর কেশব ভারতী কিছুদিন কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম

থানার খাটুন্দি গ্রামে তাঁর শ্রীপাট স্থাপন করেন। ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাধনার উদ্দেশ্যে নির্জন বনে নদীতীরে 'ভজনস্থলী' বা আশ্রম গড়ে তোলেন কাটোয়ায়। তার আগে কাটোয়ার এই অংশে কোনও বসতি ছিল না। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত 'ভারতীর গোড়ে' নামে পুকুরটি আজও আছে।

বৈষ্ণব সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বহু পূর্বেই কাটোয়া ইন্দ্রাণী পরগণা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ইন্দ্রপত্নী শচী দেবী দেবর্ষি নারদের পরামর্শে ভাগীরথী ও অজয়ের সংগমস্থলে তপস্যা করে বাসবকে পতিরূপে লাভ করেছিলেন বলে এই প্রয়াগতুল্য তীর্থের নাম হয়েছিল ইন্দ্রাণী। এখানে এক সময় ইন্দ্রেশ্বরের এক বিশাল প্রস্তরনির্মিত মন্দির গড়ে উঠেছিল। কেশব ভারতীর আমলে এই মন্দিরের অস্তিত্ব না থাকলেও ইন্দ্রাণী মহাতীর্থের খ্যাতি তখনও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকায়, তিনি এই মহাতীর্থকে তাঁর সাধনভজনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বলে মনে হয়। অজয়-ভাগীরথীর সংগমের মহিমা এক সময় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে দ্বাদশ শতকে জয়দেব গোস্বামী কেন্দুলি থেকে এখানে নিত্য স্নান করতে আসতেন এমন জনশ্রুতিও আছে। আজও কাটোয়া থানা ইন্দ্রাণী পরগণা বলে পরিচিত। কাটোয়ার গৌরাঙ্গপাড়ায় রাধাকান্ত জিউর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। কথিত, নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে রাসক্লান্ত রাধাকান্ত বিগ্রহ দর্শন করে তবেই মস্তকমুণ্ডন করেছিলেন।

গয়ায় ঈশ্বর পুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে (জানুয়ারি ১৫০৯) ফেরার পর মাত্র বারো মাসের (জানুয়ারি ১৫১০) মধ্যে নিমাই কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়েছিলেন। গবেষকের মতে, সেই সময় ''পূর্ব্বভারতে কোনও স্থানীয় এবং স্বীকৃত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল না। তাই নিমাই 'ভারতী' সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।''[৩] অনেকে বলেন, তখনও আদি শংকরাচার্যের দশনামী সম্প্রদায়ের এমনই প্রভাব ছিল যে, সন্ন্যাসী হতে গেলে সরস্বতী, পুরী, ভারতী, গিরি ইত্যাদি উপাধিধারী কারও কাছ থেকে দীক্ষা না নিলে মানুষ সন্ন্যাসী বলে মানতে চাইত না। এটিও একটি কারণ।

কোন অনুপ্রেরণা নিমাইকে সন্ন্যাসগ্রহণে প্রবৃত্ত করেছিল তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। গবেষকদের মতে, "The motive which influenced him to adopt asceticism was probably diverse and complex; at best, it is left obscure."[৪] বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন নবদ্বীপের 'পাষণ্ডী' (বৈষ্ণববিদ্বেষী স্মার্ত পণ্ডিত, অভিচারী তান্ত্রিক, কদাচারী বৌদ্ধ সহজিয়া ও শুষ্ক পাণ্ডিত্যাভিমানীর দল) এবং 'কুতার্কিক' (নব্য স্মৃতি, নব্য ব্যাকরণ, নব্য ন্যায় শিক্ষার্থী) পড়ুয়াদের প্রতি বিরক্ত হয়ে এবং তাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিমাই সন্ন্যাসগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গোপীভাবে আবিষ্ট নিমাইকে একদিন নিরন্তর 'গোপী গোপী' উচ্চারণ করতে দেখে জনৈক ব্রাহ্মণ পড়ুয়া অশাস্ত্রীয় মন্তব্য করলে নিমাই তাকে প্রহারে উদ্যত হন। পরে তিনি নিজের মন থেকে বিদ্বেষ ভাব দূর হয়নি ভেবে অনুশোচনায় ভেঙে পড়েন। সন্ন্যাসী হয়ে তিনি সকলের কাছে ক্ষমা চাইবেন, এই বাসনা তাঁর মনে প্রবল হয়—

''যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥''

কেশব ভারতীর নবদ্বীপে যাতায়াত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে জানিয়েছেন, নিমাই গোপনে তাঁকে বলেছিলেন,

''তুমি তো ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন॥
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী।
যে করাহ সে করিব স্বতন্ত্র নহি আমি॥''

নিমাইয়ের ব্যাকুলতা লক্ষ করে কেশব ভারতী সম্ভবত নিমাইকে কাটোয়ায় তাঁর আশ্রমে দীক্ষাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অনেকের মতে, বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের প্রকৃত কারণ ফুটে ওঠে—

''প্রভু বোলে শুন সার্বভৌম মহাশয়।
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইলু শিখা-সূত্র মুড়াইয়া॥''[৫]

কৃষ্ণ-অন্বেষণ এবং হরিনাম প্রচারের পথ পরিষ্কারই ছিল তাঁর সংসার ত্যাগের কারণ। এর পেছনে জীব উদ্ধারের ইচ্ছাও যে ছিল না তা নয়। নবদ্বীপে কাজির কাছ থেকে কীর্তন করার অধিকার বুঝে নেওয়ার পর ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ গৃহস্থেরা একজন গৃহী মানুষের কাছ থেকে ভক্তিমার্গকে হয়তো মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই নিমাই ভাবলেন সন্ন্যাস নেওয়ার কথা—

''অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥''[৬]

তাছাড়া নিমাই বুঝেছিলেন, সন্ন্যাস ব্যতীত সর্বলোকের শ্রদ্ধা যেমন অর্জন করা যায় না, তেমনি লোকশিক্ষাও সম্ভব নয়। নবদ্বীপের বৈষ্ণব গোষ্ঠীর স্বীকৃতি এবং ভক্তি আন্দোলনের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিমাই নবদ্বীপ পরিত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন,[৭] কেউ কেউ এ-ও মনে করেন।

মায়ের স্নেহ, পত্নীর অনুনয়—কোনও কিছুই নিমাইকে সংকল্পচ্যুত করাতে পারেনি। নিমাইয়ের অন্তরাত্মায় এসেছিল এক নতুন আহ্বান। বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য তাঁকে প্রেমভক্তির প্রবাহ সঞ্চালিত করতে হবে। গৃহত্যাগ না করলে সেই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দেওয়া যাবে না। চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, বিচ্ছেদবেদনায় ক্লিষ্ট নদীয়ার ভক্তদের আশ্বাস দিয়ে নিমাই বলছেন,

''লোকরক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেক তোমরা সব চিন্তা কর নাশ॥
নিত্যানন্দকে নিভৃতে জানালেন—
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
ইন্দ্রাণি নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম॥''

সন্ন্যাসের পূর্বদিন রাত্রে নিমাই শেষবারের মতো মায়ের হাতের রান্না তাঁর প্রিয় 'দুগ্ধ-লাউ' ভক্ষণ করে এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে স্নেহালিঙ্গন জানিয়ে ভোর রাতে সকলের অগোচরে গৃহত্যাগ করেন।

নিত্যানন্দকে তিনি আগেই জানিয়েছিলেন জনা পাঁচেকের বেশি মানুষ যেন একথা না জানে—

''তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত
এ পঞ্চজনারে কথা কহিবা বিদিত॥
আমার জননী গদাধর ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য অপর মুকুন্দ॥''

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। প্রাতঃকালে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হওয়ায় ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। এদিকে দুচারজন অন্তরঙ্গ পার্ষদকে সঙ্গে নিয়ে নিমাই কাটোয়ায় কেশব ভারতীর উদ্দেশে রওনা দেন। গৃহত্যাগ করে প্রথমে আসেন শ্রীখণ্ডে বন্ধু নরহরি সরকার ঠাকুরের বাড়ি। নরহরি বাল্যকালে দাদা মুকুন্দের ইচ্ছানুসারে নবদ্বীপে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের বন্ধুত্ব হয়েছিল।

শ্রীখণ্ড থেকে নিমাই সদলে কাটোয়ায় এসে উপস্থিত হন। কাটোয়ায় এসে যোগ দিয়েছিলেন বাসু ঘোষ। কে কে নিমাইয়ের সঙ্গে এসেছিলেন, সে-সম্পর্কেও মতভেদ যথেষ্ট। বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন, নিমাইয়ের সঙ্গী ছিলেন পাঁচজন—

''অবধূতচন্দ্র গদাধর শ্রীমুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য আর ব্রহ্মানন্দ॥''

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন,

''সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য।
মুকুন্দদত্ত এই তিন কৈল সর্বকার্য॥''

নবদ্বীপ থেকে কাটোয়া যেতে গেলে ভাগীরথী অতিক্রম করার কথা, কারণ সেই সময়ে নবদ্বীপ ছিল ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন নিমাই নদী পার হয়েই কাটোয়ায় গিয়েছিলেন—

''গঙ্গার হইয়া পার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
সেই দিন আইলেন কণ্টকনগর॥''

নিমাই কোথায় গঙ্গা পার হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস কিছু না বললেও জয়ানন্দের মতে[৮] সেটি ইন্দ্রাণী পরগনার গৌরব কাটোয়া-দাঁইহাটের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত ইন্দ্রেশ্বর ঘাট।

''মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গী নিত্যানন্দ।
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে পার হৈল গৌরচন্দ্র॥''

জয়ানন্দের বর্ণনা থেকে মনে হয়, এ-পথের সঙ্গে নিমাইয়ের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। এর আগে পিতার পিণ্ডদানের জন্য গয়া গমনকালে নিমাই ইন্দ্রাণীর কাটোয়া, অজয় নদ, একডালা, গৌড়, কানাই নাটশাল প্রভৃতি পথ ধরেই গিয়েছিলেন এবং ফেরার সময়ও বৈদ্যনাথ ধাম দর্শন করে সাঁওতাল পরগনা ও বীরভূম অতিক্রম করে সম্ভবত ইন্দ্রাণীতেই রাত্রিবাস করে গঙ্গা পার হয়ে নবদ্বীপে ফিরেছিলেন।

যাইহোক, ভাগীরথী অতিক্রম করে নিমাই ঊর্ধ্বশ্বাসে কাটোয়ার দিকে রওনা দিলেন। দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে তিনি কাটোয়ার সন্নিকট বর্তমান ঘোষহাটের কাছে একটি মাধবীবৃক্ষের নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেখানেই আজ মাধাইতলা—নিমাইকে কলসির কানা ছুঁড়ে বিখ্যাত হওয়া মাণিকজোড়ের অন্যতম মাধাইয়ের নামে। কথিত, গৌরাঙ্গবিরহে কাতর হয়ে মাধাই কাটোয়া আসেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তখন কাটোয়া ছেড়ে চলে গেছেন। তাই তাঁর বিশ্রামস্থলেই আশ্রম গড়ে সাধনা শুরু করেন মাধাই। 'মাধবী কুঞ্জ' আজও সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে।

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, নিমাই গোধূলিবেলায় কেশব ভারতীর আশ্রমে পৌঁছে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে করজোড়ে অনুরোধ করলেন—

''অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
পতিত-পাবন তুমি মহাকৃপাময়॥
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাত॥''

কেশব ভারতী নিমাইকে প্রথম দর্শনে চিনতে না পারলেও তরুণ নিমাইয়ের অপূর্ব রূপ দেখে তাঁর ভাবান্তর হল। কারণ তিনি ''মনুষ্যের এরূপ কাঁচা সোনার বর্ণ, এরূপ নির্দোষ সুললিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এরূপ লাবণ্যময় ভঙ্গি, এরূপ সুচারু-চিক্কণ কেশ, এরূপ কমল নয়ন, এরূপ পরিসর বক্ষ, এরূপ আজানুলম্বিত বাহু, এরূপ ক্ষীণ-কটি, এরূপ হিঙ্গুলমণ্ডিত ওষ্ঠ করতল ও পদতল, এরূপ সুদীর্ঘ কায়া কখনও দর্শন করেন নাই।''[৯] তাঁর প্রেমভক্তি ও গুরুবন্দনায় কেশব সন্তুষ্ট হলেও, বিধির এই সুন্দর সৃষ্টিকে সন্ন্যাস দিয়ে শারীরিক কষ্ট দিতে চাইলেন না। নিমাই কেশবকে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও তিনি নানান যুক্তি দিয়ে নিমাইকে সন্ন্যাস থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। শুধু কেশবই নন—কাটোয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা, যারা ইতিমধ্যে নিমাইয়ের সন্ন্যাস নেওয়ার সংবাদে কেশবের আশ্রমে ভিড় জমিয়েছে, তারাও চায় না নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করুন।

যুক্তিতে নিমাইও কম যান না। তিনি বললেন, পঞ্চাশ বছর বয়সের আগে সন্ন্যাস নেওয়া হয়তো উচিত নয়, কিন্তু তার আগেই যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে তাঁর জীবনে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন আর হয়ে উঠবে না। চৈতন্যভাগবতকার জানিয়েছেন, বিনয়ী কেশবও নিমাইকে বললেন,

''তুমি যে জগত গুরু জানিল নিশ্চয়।

তোমার গুরুর যোগ্য কেহো কভু নয়॥
তভু তুমি লোকশিক্ষা নিমিত্ত কারণে।
করিবা আমারে গুরু হেন লয় মনে॥”

কিছু পরে কেশব ভারতী সন্ন্যাসদীক্ষা দিতে রাজি হলেন। কিন্তু তাঁর মনের যন্ত্রণা অন্যত্র—নিমাইয়ের মতো ‘পূর্ণব্রহ্ম সনাতন’ স্বয়ং ভগবানের যোগ্য গুরু হতে তিনি পারবেন তো? এদিকে তাঁর সম্মতি পাওয়ার পর কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা নিমাইয়ের ‘‘ক্ষণে কম্প, ক্ষণে স্বেদ, ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়।” প্রথম রাত্রি এভাবে কেশবের আশ্রমে অতিবাহিত করলেন নিমাই। নিশি পোহালে তাঁর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর আচার্য ‘সর্ববিধ যোগ্য কার্য’ সম্পাদনে উদ্যোগী হলেন। নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণের বার্তা বিদ্যুদ্‌বেগে সর্বত্র রটে গেল। যে যেখান থেকে পারল নানান উপচার নিয়ে উপস্থিত—

‘‘নানা গ্রাম হইতে সে নানা উপায়ন।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য কথন॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মুদগ তাম্বুল চন্দন।
পুষ্প যজ্ঞসূত্র বস্ত্র আনে সর্বজন॥”

অতঃপর ডাক পড়ল ক্ষৌরকারের। ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থে ক্ষৌরকারের ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়—মধু প্রামাণিক, মধুসূদন শীল, কলানিধি নরসুন্দর, কলাধর, বিম্বুদাস, বিষ্ণুদাস, বিপ্রদাস, দেবা, হরিদাস প্রভৃতি। তবে মধু প্রামাণিক নামটাই অধিক মান্যতা পায়। যাইহোক, ক্ষৌরকার এসে নিমাইয়ের ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম দেখে ইতস্তত করতে লাগল—

‘‘ক্ষুর দিতে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
হাথ নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে॥”

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ভাষায়—

‘‘আমার শকতি নাহি করিতে মুণ্ডন।
সুন্দর কুঞ্চিত কেশ ত্রৈলোক্যমোহন॥”

শেষ পর্যন্ত নিমাইয়ের সকাতর মিনতির ফলে ক্ষৌরকার স্বকার্য সম্পাদন করল। শোনা যায়, চোখের জলে শেষবারের মতো ক্ষৌরকর্ম সমাধা করে সেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। কাটোয়া হরিসভা পাড়ায় মধু প্রামাণিকের ভজনস্থল এবং গৌরাঙ্গবাড়িতে নিমাইয়ের কেশ-সমাধি আজও এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। মধু নাপিতের বাড়িটি এখন ‘সখীর আখড়া’ নামে পরিচিত।

মস্তক মুণ্ডনের পর গঙ্গাস্নান সেরে এলেন নিমাই। সন্ন্যাসদীক্ষা সম্পন্ন হল ‘গোঁসাই ঘাট’ (বর্তমান নাম কালীবাড়ির ঘাট) নামক গঙ্গার ঘাটে। গুরু নিমাইকে একখণ্ড কৌপীন, দুখণ্ড বহির্বাস, ভিক্ষাপাত্র ও একটি দণ্ড প্রদান করলেন। কিন্তু কী মন্ত্রে দীক্ষা হবে? চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়, নিমাই তাঁকে আগেই বলে রেখেছেন—‘হেন দীক্ষা দেহ যেন হঙ কৃষ্ণদাস’। কারণ দশনামী সম্প্রদায়-ভুক্ত কেশব হয়তো রীতি অনুযায়ী তাঁকে দীক্ষা দেবেন ‘তত্ত্বমসি’ মন্ত্রে, অর্থাৎ ‘তুমিই সেই’। কিন্তু নিমাই তো অভেদ হতে চান না ঈশ্বরের সঙ্গে,

তিনি তাঁর দাস হয়ে থাকতে চান। কেউ কেউ বলেন, নিমাই মন্ত্রটিকে ষষ্ঠী সমাসান্ত করে গুরুকে নিজের দীক্ষামন্ত্র নিজেই বলে দিয়েছিলেন—'তস্য ত্বমসি'—'তুমি তাঁর'। লোচনদাসের ভাষায়—

''ইহা বলি ভারতীর কর্ণে কহে মন্ত্র।
প্রকারে হইল গুরু আপনে স্বতন্ত্র॥''

নিমাইয়ের নামকরণের মধ্যেও ঘটে গেল মহা বিপ্লব। গুরু শিষ্যের কী নামকরণ করবেন তা নিয়েও চিন্তায় পড়লেন, কারণ—

''চতুর্দশ ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব॥''

নিমাই 'ভারতী' সম্প্রদায়ের গুরুর কাছে দীক্ষা নিলেন বলে তাঁর উপাধি 'ভারতী' হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু গুরু তাঁকে কোনও সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে বাঁধলেন না। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম দিয়ে বললেন,

''যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য কীর্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥''

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (সংক্ষেপে চৈতন্য) নাম ধারণ করে নিমাইয়ের পুনর্জন্ম হল। সম্পত্তি বলতে রইল একখানি দণ্ড, নারকেলমালার জলপাত্র, কৌপীন-বহির্বাস এবং শীত নিবারণের জন্য একখানা ছেঁড়া কাঁথা। পরিকরবেষ্টিত হলেও তিনি সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন, একলা পথের পথিক।

নিমাইয়ের দীক্ষাস্থল আজকের গৌরাঙ্গবাড়ি—কাটোয়া নিচুবাজারের কাছে গৌরাঙ্গপাড়ার শেষপ্রান্তে। ঢুকতেই চোখে পড়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু সুরম্য প্রবেশ তোরণ। বামদিকে বিশাল অশ্বত্থ গাছ। এর তলেই শ্রীচৈতন্যের ক্ষৌরকর্ম হয়েছিল। পাশেই সন্ন্যাসগ্রহণ ও নামপ্রকাশের স্থান। কাছেই কেশব ভারতীর সমাধি; শ্বেতমর্মরে কেশব ও চৈতন্যের পায়ের ছাপ। তোরণের ডানদিকে ঘটাকৃতি তুলসীমঞ্চ, তার পাশে মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি ও গদাধর দাসের সমাধি।

গৌরাঙ্গবাড়ির মাঝে বিশাল নাটমন্দির এবং মহাপ্রভুর মন্দির—১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে গৌরাঙ্গের ভজন-সঙ্গী ও অনুচর গদাধর দাসের নির্মিত। মহাপ্রভুর নীলাচলে লীন হওয়ার পরে তিনি ফিরে আসেন নবদ্বীপে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দেহত্যাগের পর তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে কাটোয়ায় চলে আসেন। যেখানে মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, সেখানেই গড়ে তোলেন গৌরাঙ্গ মন্দির। মনে করা হয় ওই স্থানেই ছিল কেশব ভারতীর আশ্রম। তবে বর্তমানে আশ্রমের অবশেষ চোখে পড়ে না। মন্দিরে রয়েছে নিতাই-গৌরাঙ্গ-জগন্নাথের দারুবিগ্রহ। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসবেশ দেখে যাতে ভক্তদের মনে কষ্ট না হয়, সেজন্য শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার প্রথম তিনটি 'রসরাজ-মহাভাব'-এর বিগ্রহ তৈরি করিয়েছিলেন।

বৈষ্ণবতীর্থ কাটোয়ার আর এক আকর্ষণ মাধাইতলা। দীর্ঘকাল জায়গাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন বৃন্দাবনের গোপীনাথ দাস বাবাজি। এখানে গৌর-নিতাই, নাড়ুগোপাল রয়েছেন নিজ নিজ মন্দিরে। রয়েছে মাধাইয়ের সমাধিমন্দির।

রাধাগোবিন্দ নাথ জ্যোতিষ গণনার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি শনিবার সংক্রান্তির দিন সকাল সাতটা তিরিশ থেকে আটটার মধ্যে পূর্ণিমা থাকাকালীন নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই হিসাবে ২৩ জানুয়ারি বুধবার শেষ রাত্রে (বৃন্দাবন দাসের মতে চার দণ্ড রাত্রি থাকতে) নবদ্বীপ ত্যাগ করে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ২৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে মহাপ্রভু কাটোয়ায় আগমন করেন। ২৫ জানুয়ারি শুক্রবার সকাল ন-টায় পূর্ণিমা আরম্ভ হলে শুরু হয় ক্ষৌরকর্মের আয়োজন।[১০] সন্ন্যাসকালে নিমাইয়ের বয়স ছিল তেইশ বছর এগারো মাস ছয় দিন।

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, দীক্ষা শেষে—

''পরিলেন অরুণ বসন মনোহর।
তাহাতে হইল কোটি কন্দর্প সুন্দর॥
সর্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দন লেপিত।
মাথায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত॥''

তাঁকে,

''কণ্টকনগরের লোক দেখিবারে যায়।
যে দেখয়ে তার হিয়া নয়ন জুড়ায়॥''

সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনায় নিমাইয়ের পরিকরদের মধ্যেও শুরু হল ক্রন্দনের রোল। নবদ্বীপ থেকে তাঁরা এসেছিলেন নিমাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু সেইকাজে তাঁরা সফল হননি। ভাবাবেগে বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত নিমাইয়ের করুণ অবস্থায় তাঁরাও ব্যথিত। বৃন্দাবন দাসের লেখনীতে—

''নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সভে করেন ক্রন্দন॥''

সন্ন্যাসগ্রহণের পর চৈতন্যদেব গুরুর অনুরোধে সেই দিনটি অতিবাহিত করলেন কাটোয়ায়। সমস্ত রাত্রিদিন ভারতী ভবনে কৃষ্ণবিষয়ক নৃত্যগীতে মাতোয়ারা হয়ে রইলেন। লোচন দাসের ভাষায়—

''করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্তনের রোল।
চৌদিকে সকল লোক বোলে হরিবোল॥''

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরদের দেখাদেখি কণ্টকনগরের আবালবৃদ্ধবনিতা কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য শুরু করলেন। পরদিন নবীন সন্ন্যাসীকে তাঁরা বিদায় দিতে নারাজ। সকলেই তাঁর সঙ্গী হতে চান, কিন্তু উপায় নেই। এক সময় বিদায় জানাতেই হয়। গুরু কেশবের জীবনে আবার দ্বন্দ্ব। তিনিও কি শিষ্যকে বিদায় জানাবেন, নাকি তাঁর সঙ্গী হবেন? শীঘ্রই সে-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠলেন। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, গুরু নতুন শিষ্যের সঙ্গ ছাড়লেন না—

''গুরু বোলে আমিহ চলিব তোমা সঙ্গে।
থাকিব তোমার সঙ্গে সঙ্কীর্তন রঙ্গে॥
কৃপা করি প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে।
আগে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে॥''

কাটোয়ায় সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়ে চৈতন্যদেব কোথায় যাবেন সে-সিদ্ধান্ত যে আগে থেকেই নিয়েছিলেন, এমন মনে হয় না। তবে বৃন্দাবনে যাবেন, মোটামুটি এইরকম কথাই হয়তো ছিল। সেইজন্য ২৭ জানুয়ারি সকালে কাটোয়া ত্যাগ করার পূর্বে তিনি চন্দ্রশেখর আচার্যকে তাঁর মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ দিয়ে নবদ্বীপে পাঠালেন। বৃন্দাবন দাসের রচনায় জানা যায়, কাটোয়া থেকে বিদায় নিয়ে চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে যাচ্ছেন মনে করে ভাবাবেশে তিন-চারদিন সপার্ষদ রাঢ় দেশ ভ্রমণ করেছিলেন।

রাঢ় পরিক্রমায় শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কে কে ছিলেন বলা কঠিন। অনেকের ধারণা মহাপ্রভু গদাধরকে সঙ্গে নিতে চাননি বলে গদাধর সম্ভবত কাটোয়াতেই রয়ে গেলেন। নরহরি, দামোদর, বক্রেশ্বর প্রমুখ তখন শোকে মুহ্যমান। তাঁদের শোক প্রশমিত হওয়ার আগেই চৈতন্যদেব তাঁদের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তাহলে বাকি রইলেন নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ ও কেশব ভারতী। সম্ভবত এঁরাই ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী।

সেই সময় কাটোয়া মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে চৈতন্যদেবের পাদস্পর্শ হয়েছিল, কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে তার বিশেষ উল্লেখ না থাকলেও, জনশ্রুতির ভিত্তিতে স্থানগুলির ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করা যায়। কাটোয়া থেকে বেরিয়েই চৈতন্যদেব পশ্চিমমুখে ছুটতে শুরু করেন। ইচ্ছা, এক নিঃশ্বাসে বৃন্দাবন পৌঁছন। এইভাবে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে ছুটতে কখনও তিনি ক্লান্ত হয়ে বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছেন, কখনও জ্ঞান হারাচ্ছেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ প্রমুখ পরিকর পিছু পিছু দৌড়ে তাঁকে সামলাতে পারছেন না। নৃত্য-রোদনে বিভোর নবীন সন্ন্যাসী পথ চলতে চলতে কাটোয়ার কাছে যাজিগ্রামের একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে প্রথম বিশ্রাম নিয়েছিলেন। স্থানটি

'বিশ্রামতলা' বলে পরিচিত।

যাজিগ্রামের পর শ্রীখণ্ড গ্রাম। চলতিপথে শ্রীচৈতন্য সপার্ষদ তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকর নরহরি সরকারের বাড়িতে এসেছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ ও রায়শেখরের দু-একটি পদ, বাসুদেব ঘোষের একটি পদের ভিত্তিতে এই ঘটনা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

এই সময় কেতুগ্রাম থানার কুলাই গ্রামের বাসুদেব ঘোষের বাড়িতে এবং অজয়-তীরবর্তী নপাড়াতেও কিছুক্ষণের জন্য চৈতন্যদেব অবস্থান করেছিলেন। তিনি কেতুগ্রামের 'বেলতলার চাটুজ্যেবাড়ি'র বাইরে বর্ষাপুকুরের পাড়ে একটি বেলতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে 'আমানি জল' (পান্তাভাতের জল) খেয়ে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করেন। ফেরার পথে কাঁদরা গ্রামে মঙ্গল ঠাকুরের আতিথ্যও গ্রহণ করেন। সম্ভবত কাঁদরার 'গৌরাঙ্গডাঙা' সে-ঘটনার স্মারক। পঞ্চম দিনে তিনি কাটোয়ার রসুই গ্রামে পদধূলি দেন।

রাঢ় থেকে ফেরার পথে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা বাহ্যজ্ঞানহীন চৈতন্যদেব মঙ্গলকোট থানার চৈতন্যপুর গ্রামে বাহ্যজ্ঞান (চৈতন্য) ফিরে পান। এই কারণেই গ্রামটির নাম 'চৈতন্যপুর'। তিনি এই সময় কাছাকাছি লোচনের বাসস্থান অর্থাৎ কোগ্রামের কাছে একটি বটবৃক্ষের নিচে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। স্থানটি ভক্তদের কাছে পবিত্র।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকলেও অনেকটা উপেক্ষিতই রয়ে গেছে গৌরাঙ্গপদধূলিধন্য শহর কাটোয়া। পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠার সম্ভবনা থাকলেও প্রচারের আলো না থাকায় অবহেলিত গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসক্ষেত্র। যোগাযোগব্যবস্থার অপ্রতুলতাও এর অন্যতম কারণ। তবে প্রচারের আলো পড়লে অদূর ভবিষ্যতে কাটোয়া যে পর্যটন মানচিত্রে নিজের পৃথক স্থান অর্জন করতে পারবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। বৃন্দাবন দাস, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত (দে'জ, কলকাতা, ২০১৫), [এরপর, *চৈতন্যভাগবত*]

২। কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত*, (গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১৪), [এরপর, *চৈতন্যচরিতামৃত*]

তথ্যসূত্র

১। Biplab Dasgupta, *European Trade and Colonial Conquest*, Vol. 1, Anthem Press, Delhi, 2005, pp. 338-339

২। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *চৈতন্যদেব*, বর্তমান শারদীয়া সংখ্যা, ১৪১০, পৃঃ ১৪

৩। রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম* (আনন্দ, কলকাতা, ২০১৫), পৃঃ ৭৬

৪। Sushil Kumar De, *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal*, (General Printers and Publishers, Kolkata, 1942), pp. 60-61

৫। *চৈতন্যভাগবত*, পৃঃ ৩৪৬

৬। *চৈতন্যচরিতামৃত*, পৃঃ ১৫৭

৭। সম্পাদক : অবন্তীকুমার সান্যাল এবং অশোক ভট্টাচার্য, *চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান*, (প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫), পৃঃ ৩২

৮। বিমানবিহারী মজুমদার এবং সুখময় মুখোপাধ্যায়, *জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল*, (দ্য এসিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭১), পৃঃ ১৩৯

৯। শিশিরকুমার ঘোষ, *শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত*, (করুণা পুস্তকালয়, কলকাতা, ২০১৪), পৃঃ ২৫১

১০। মজুমদার, বিমানবিহারী, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, (সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৬), পৃঃ ২৬-২৭